ইতিহাসের অজানা অধ্যায়

——— ইমরান রাইহান

ইতিহাসের অজানা অধ্যায়

ইমরান রাইহান

চেতনা
প্রকাশন

বই : ইতিহাসের অজানা অধ্যায়
লেখক : ইমরান রাইহান
প্রকাশকাল : ইসলামি বইমলো ২০২২
প্রকাশনা : ২৬
প্রচ্ছদ : আহমাদুল্লাহ ইকরাম
বানান সমন্বয় : উমেদ
পৃষ্ঠাসজ্জা : চেতনা
মুদ্রণ ও বাঁধাই : বই কারিগর
প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ, মোবাইল : ০১৭১২-৯৪৭ ৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার, পরিধি

মূল্য : ২৬৪.০০৳

Itihaser Ojana Oddhay by Imran Raihan
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

অর্পণ

স্নেহের মুহাম্মদ বিন নুরুল ইসলামকে।
তুমি যে আমার পাঠক হয়ে উঠবে ভাবিনি কখনো।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

নিশাপুরের চিঠি—১৩
সালাফদের ইলমচর্চার এক ঝলক—২৭
শাইখুল ইসলামের দৃঢ়তা—৩১
আন্দালুসের পতন : ইতিহাস যে শিক্ষা দেয়—৩৭
ইয়াজিদি ধারা : ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়—৪৩
মানসা মুসা ও তার স্বর্ণের খনির সাম্রাজ্য—৫১
ইথিওপিয়া : জুলুমের অজানা আখ্যান—৫৩
মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস—৬৫
হারিয়ে যাওয়া কুতুবখানা—৮৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাহাওয়ালপুর মোকদ্দমা—৯১
নুর কুতুবুল আলম : দুর্যোগকালের মহানায়ক—১০৩
বাংলায় মুসলিম শাসন : সুলতানি আমল—১১১
ঈসা খান : ভাটিবাংলার মহানায়ক—১১৯
সুলতানি আমলে ভারতবর্ষে হাদিসচর্চা—১২৫
ভারতীয় আলেম আরবভূমিতে—১৩৭
চেরুমন পেরুমল কি সাহাবি ছিলেন?—১৩৯

তৃতীয় অধ্যায়

উইচহান্ট : ইউরোপের ইতিহাসে কলঙ্কের তিলক—১৫৫
গোয়া ইনকুইজিশন : পর্তুগিজ শাসনের কালো অধ্যায়—১৬০
কমিউনিজমের লাল সন্ত্রাস—১৬৭

ভূমিকা

জ্ঞানের যেসব শাখায় মুসলিম উম্মাহর প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ, প্রবল আত্মবিশ্বাস, অসম দৃঢ়তা, অকুণ্ঠ সততা ও নিরন্তন বুদ্ধিবৃত্তিক ধারায় তাত্ত্বিক আলাপ করতে পারেন, তন্মধ্যে 'ইতিহাসশাস্ত্র' অন্যতম। কঠোর শাস্ত্রীয় বিচার, অতলস্পর্শী পর্যবেক্ষণ, সত্যের নিকটে পৌঁছার প্রাণান্ত আকুতি, সম্ভাব্য কুসুম-কল্পনা পরিহার করে, প্রান্তিকতামুক্ত একান্ত সত্যে-সমর্পিত হয়ে, তারা যতটুকু নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী ও গোত্রমাধ্যমের কলমে ততটুকু সততা, কিংবা নিদেনপক্ষে সত্যটুকু তুলে ধরার সৎ-সাহসও লক্ষ করা যায়নি।

পাশ্চাত্য তো আলেকজান্ডারের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে একপর্যায়ে বলেই ফেলল, 'আলেকজান্ডার তামাম দুনিয়া পরাভূত করে, পরিশেষে সমুদ্র-দেবতা ও সাগর-রাক্ষসদের পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়েছে!' এর বাইরে গ্রিক, নর্স, জার্মান আর রোমানদের গাল-গল্পের কথা না-হয় বাদই দিলাম!

ওদিকে প্রাচীন ভারত, মিসর, পারস্য ও চৈনিক পৌরাণিক কাব্য-কাহিনি আর মুখরোচক গল্পও কম নয়। শুধু হন্য নয়, বন্য হয়ে খুঁজেও সত্যের আভাসটুকু বের করা যেন সুঁইয়ের ছিদ্রে উট প্রবেশ করানোর নামান্তর।

এসব প্রত্যক্ষ ও প্ররোক্ষ বাস্তবতা এবং জগৎসংসারের চাল-চারিত্র্যের মাঝে মুসলিম ঐতিহাসিকদের সততা, স্বচ্ছতা, ন্যায়-নিষ্ঠতা ও প্রমাণ-প্রিয়তার যে নজির, তার তুল্যমূল্য উপমেয় অন্যকিছু হতে পারে না। সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ মুসলিম ঐতিহাসিকগণ যথেষ্ট সততা, আন্তরিকতা ও পরিব্যাপ্তিতার লক্ষ্যে, এ শাস্ত্রের যথাযথ পঠন-পাঠন ও সংকলন-প্রণয়ন করেছেন। শাস্ত্রীয় মূল্যবান কার্যকরী নীতির আলোকে বর্জন করেছেন, মিথ্যা, আষাঢ়ে-গল্প, নিতান্ত দুর্বল ও অসংলগ্ন কথামালা।

হ্যাঁ, ইতিহাস তো আর অবতীর্ণ ওহি না। মানবীয় দুর্বলতা ও অক্ষমতার দায়ে সামান্য ও ক্ষেত্রবিশেষ অসামান্য উনিশ-বিশ, কিংবা ফারাক-ব্যবচ্ছেদ থেকে যেতেই পারে। তবে সমষ্টিগত দৃষ্টিতে অন্যদের তুলনায় বেশি প্রমাণনিষ্ঠ, ভারসাম্যপূর্ণ ও সত্যানুসন্ধানী ইতিহাস, প্রাজ্ঞ মুসলিম ইতিহাসবিদরাই লিখে গেছেন। তথাপি প্রবাদের বোলচালে বলা হয়, 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' নীতিতে মুসলিমদের তারিখি তুরাসকেই যেন কাঠগড়াই বেশি দাঁড়াতে হয়েছে। ছায়াদার গাছকেই যেন বেশি ঢিল খেতে

হয়েছে। যুগে যুগে 'সত্য' এ জন্য-ই নিন্দিত, কারণ সে সত্য। আর 'মিথ্যা' এ জন্য-ই নন্দিত, কারণ সে প্রলেপকৃত।

ইতিহাসের অজানা অধ্যায়, সময়ের নানা বাঁকে ও অধ্যায়ে ঘটিত, তুলনামূলক কম আলোচিত, কিন্তু যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ও উৎসাহব্যঞ্জক একাধিক সত্য-ঘটনার সংকলন। নির্ঝর গদ্যে, আকর্ষণীয় উপস্থাপনায়, অনুপম বাচনভঙ্গিতে লেখক ঘটনাগুলো পাঠক-সমীপে তুলে ধরেছেন। বর্ণনার তালে পরিমিত ভাষায়, ঘটনা থেকে প্রাপ্ত আলোটুকু হালকা-চালে নির্ণীত করে দিয়েছেন। যেন পাঠ-পরিক্রমায় একঘেঁয়ে ও ক্লান্তিবোধ মস্তিষ্কে জায়গা নিতে না পারে।

এ ছাড়া ইতিহাস-বিষয়ক কিছু প্রশ্ন, কিছু মিথ্যাচারের হাকিকত, সমকালীন বাস্তবতার কিছু দিক-নির্দেশনাও এতে প্রস্তাবনামূলকভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। প্রতিটি তথ্যের সম্ভাব্য উৎসমূলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথবা একাধিক উৎসের সারাৎসার ফুটনোটে বলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

তরুণ ইতিহাসবিদ, প্রত্যয়দীপ্ত লেখক, মাওলানা ইমরান রাইহান আমাদের সময়ের একজন ধীমান, বিচক্ষণ ও সময়সচেতন আলিম। মাথার মুকুট সালাফে-সালেহিনের রেখে যাওয়া ইলমি আমানত, সময়োপযোগী ভাষায় এ অঞ্চলের মানুষের সামনে উপস্থাপনে তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। তাঁর প্রতিটি রচনায় কোমল ভাষায় দীনের প্রতি ফেরার মায়াবী আহ্বান থাকে। এই সময়ে দীনি অঙ্গনে বিশুদ্ধ ইতিহাসচর্চা ও সালাফের ইলমি তুরাসের প্রসারতা নিয়ে যারা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন, তিনি তাঁদের পথিকৃৎ। ইতিমধ্যে প্রায় বিশটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা উপহার দিয়েছেন। চেতনা প্রকাশন এ যাবৎ তাঁর অনেকগুলো বই প্রকাশ করেছে। আল্লাহর রহমতে এ ধারা সামনেও অব্যাহত থাকবে।

ওয়াহিদুর রহমান

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪
৩ অক্টোবর ২০২২
সোমবার

উইচহান্ট : ইউরোপের ইতিহাসে কলঙ্কের তিলক

শহরের চৌরাস্তায় স্থাপন করা হয়েছে বেদি। একপাশে স্তূপাকারে রাখা জ্বালানি কাঠ। পাশে হাতমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে এক নারীকে। নারীর চেহারায় মারধরের চিহ্ন। চেহারায় ছোপ ছোপ রক্ত জমাট বেঁধেছে। দু-চোখের নিচে শুকিয়ে আসা অশ্রুর দাগ। কাল সারা রাত কেঁদেছে সে—নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য। তবে এখন আর কাঁদছে না সে, জানে কেঁদে কারও মন গলাতে পারবে না। এর চেয়ে মন শক্ত করে নেওয়াই ভালো। চারদিকে উৎসুক জনতার ভিড়। নারীটিকে গালিগালাজ করছে তারা। কেউ কেউ ঢিল ছুড়ে মারছে তার দিকে।

কালো পোশাক পরা একজন যাজক ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলেন। বিড়বিড় করে কিছু বলছেন তিনি। জনতা আগ্রহভরে তাকিয়ে আছে তার দিকে। যাজক হাত তুলে ইশারা করলে থেমে গেল জনতার শোরগোল। গম্ভীর কণ্ঠে কথা শুরু করলেন যাজক, এই মহিলার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। গোপনে জাদুবিদ্যা চর্চা করত সে। সে একজন ডাইনি। তার কারণে এই এলাকায় ভর করেছে শয়তানের ছায়া। বলতে বলতে বুকে আঙুল দিয়ে ক্রস আঁকলেন যাজক। উপস্থিত জনতা ভয়ার্ত চেহারায় অনুসরণ করল যাজককে।

এই অভিশপ্ত নারীকে আর জীবিত রেখে প্রভুর ক্রোধের মুখে পড়তে চাই না। এখুনি তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছি—হিংস্রকণ্ঠে বললেন যাজক। সমস্বরে সায় জানাল জনতা। নারীর চেহারা ভাবলেশহীন, কিন্তু তার দু-চোখে বিষাদের ছায়া। তার চোখের সামনেই লাকড়িতে আগুন ধরানো হলো, দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠতেই শিউরে উঠল নারীটি। তার মনের সব সাহস উবে গেছে, কান্না করে যাজকের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছে সে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন যাজক। ঘৃণাভরে থুতু ছুড়লেন মহিলার দিকে।

যাজকের নির্দেশে দুজন শক্তপোক্ত পুরুষ শক্ত করে ধরল মহিলাকে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল জ্বলন্ত লাকড়ির ভেতর। শরীরে আগুনের আঁচ পেতেই তীব্র স্বরে চিৎকার করে উঠল সে, ভিড়ের ভেতর অপেক্ষারত মহিলার স্বামী শিউরে উঠল। চোখের সামনে প্রিয়তমা স্ত্রীর নৃশংস মৃত্যু দেখেও চুপ থাকতে হচ্ছে তাকে। জানে গির্জা অসন্তুষ্ট হলে কেড়ে নেওয়া হবে তার সকল সহায়-সম্পত্তি, সন্তানদের পাঠানো হবে কারাগারে। চামড়া পোড়ার বিশ্রী গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে, উল্লসিত জনতা পাথর

ছুড়ে মারছে ভস্মীভূত মহিলার দিকে। কাঠ ফাটার শব্দে চাপা পড়ে গেছে মহিলার চিৎকার, ক্রমেই আগুনের শিখা গ্রাস করে নিচ্ছে তাকে।

নৃশংস এই দৃশ্যের পটভূমি ইউরোপ। সময়কাল খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী। সে সময় অদ্ভুত এক পাগলামি শুরু হয়েছিল পুরো ইউরোপজুড়ে। কথিত ডাইনি জুজুর ভয়ে কাঁপছিল গোটা ইউরোপ। ডাইনিরা শয়তানের অনুসারী, তারা জাদুচর্চা করে, কালো বিড়াল পালে, ঝাড়ুর পেছনে বসে বাতাসে উড়ে—এমন নানা হাস্যকর গুজবে বিশ্বাস করে হত্যা করা হয়েছিল লাখ লাখ মহিলাকে, যাদের বেশিরভাগই ছিল নিরপরাধ। নৃশংস এসব হত্যাকাণ্ডের পেছনে সরাসরি জড়িত ছিল গির্জা ও পাদরিরা, সামনে ছিল রাজদণ্ড।

কথিত এই ডাইনি দমন-প্রক্রিয়া ঠিক কবে শুরু হয়েছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে অনুমান করা যায়, ১৪৫০ সাল থেকেই এর সূত্রপাত। এর পেছনে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা ছিল কি না, তা জানা মুশকিল, কিন্তু দ্রুতই দেখা গেল বিষয়টি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপীয় সমাজে যেকোনো গুজব খুব দ্রুত ডালপালা মেলত। ইউরোপের অধিকাংশ লোকই তখন ছিল মূর্খ ও অশিক্ষিত, ফলে তাদেরকে যেকোনো কথা খুব সহজেই বিশ্বাস করানো যেত। ঘটনার পেছনের ঘটনা বিশ্লেষণ করার মতো বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা তাদের ছিল না, ফলে গির্জা কিংবা রাজদণ্ডের কর্তারা চাইলেই তাদের নিজেদের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন।

সে সময় ইউরোপে জাদুবিদ্যা চর্চা ও ডাকিনীবিদ্যা আত্মস্থ করাকে দেখা হতো তীব্র সন্দেহের চোখে। ভয়ে তটস্থ থাকত সবাই। এই মানসিক ভীতিকে কাজে লাগিয়েই শুরু হয় উইচহান্ট বা ডাইনি শিকার। বিভিন্ন অঞ্চলে গুজব ছড়াতে থাকে, অমুক অমুক মহিলা জাদুচর্চা করে, তারা ডাইনি। শুরু হয় যাচাই-বাছাই ছাড়াই মহিলাদের বন্দি ও হত্যা করার ঘটনা। কাউকে ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত করার সুবিধা ছিল এই যে, সহজেই তার সহায়-সম্পত্তি দখল করা যেত। ফলে গির্জা নিজেই এগিয়ে আসে এই ঘৃণ্য অপরাধে শরিক হতে।

কারও বিরুদ্ধে একবার অভিযোগ তোলার পর তার আর রেহাই ছিল না। কোনোপ্রকার যাচাই-বাছাই না করেই সিদ্ধান্ত দেওয়া হতো মৃত্যুদণ্ডের। সাধারণত পুড়িয়ে মারা হতো সেসব মহিলাদের। কারণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপীয়দের বিশ্বাস ছিল, ডাইনিদের স্বাভাবিকভাবে হত্যা করলে তাদের আত্মা জীবিত থাকে এবং পুনরায় অন্য কারও দেহে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং, সমাধান হলো জীবন্ত পুড়িয়ে মারা।

মধ্যযুগের ইউরোপের পথঘাটে ডাইনি শিকার ছিল পরিচিত দৃশ্য। কারও ওপর সন্দেহ হলেই হলো, বৃদ্ধা কি শিশু দেখার দরকার নেই, ধরে এনে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হতো। ডাইনি চেনার জন্য অদ্ভুত কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিল

ইউরোপীয়রা। যদি কারও ঘরে কালো বেড়াল থাকত, ধরে নেওয়া হতো সে ডাইনি। কারণ, তারা মনে করত কালো বেড়ালের সাথে কালো জাদুর সম্পর্ক আছে। যদি কোনো নারীর ঘরে কুকুর-বিড়ালের সংখ্যা বেশি হতো, ধরে নেওয়া হতো সে কালো জাদু চর্চা করছে। তাকে ধরে নিয়ে যেত গির্জা কিংবা রাজার লোকেরা।

ডাইনি চেনার জন্য অদ্ভুত সব পদ্ধতি আবিষ্কার করে ইউরোপীয়রা, যা কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। বেশকিছু গির্জা থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, অভিযুক্তদের বাইবেলের সাথে পাল্লায় ওজন দেওয়া হবে; যদি তাদের ওজন বাইবেলের সমান না হয়ে কমবেশি হয়, তাহলে তারা নিশ্চিতভাবেই ডাইনিবিদ্যা চর্চা করছে। শুরু হলো অভিযুক্তদের তদন্তপ্রক্রিয়া। বলাবাহুল্য, এই প্রক্রিয়ায় অভিযুক্তদের সকলেই ডাইনি প্রমাণিত হলো। বস্তুত এটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, কয়েক কেজি ওজনের বাইবেলের সাথে একজন মানুষের ওজন কখনোই সমান হওয়া সম্ভব নয়।

১৬৯২ সালে সারা গুড নামে এক মহিলাকে হত্যা করা হলো অদ্ভুত কারণে। অভিযোগ তোলা হলো, তাকে একাকী বিড়বিড় করতে দেখা গেছে। এর মানে, সে গোপনে জাদুচর্চা করে এবং মন্ত্র আওড়ায়। সারা গুড বারবার বলছিলেন, তিনি মূলত ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে শ্লোক পাঠ করছিলেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা। শহরের বাজারে এনে জীবন্ত আগুনে পোড়ানো হলো তাকে। মিস বোরেস নামে একজনকে ধরে এনে বলা হলো, বাইবেলের কিছু শ্লোক আবৃত্তি করতে। বেচারি মুখে জড়তার কারণে আটকে গেল। বেজিমুখো এক বৃদ্ধ যাজক বললেন, নিশ্চিত সে ডাইনি, তাই ঈশ্বরের বাণী আবৃত্তি করতে পারছে না!

স্কটল্যান্ডে বেশ কয়েকজন মহিলাকে ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে মারা হয়। এরা সবাই ছিলেন তাদের স্বামীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রী। যাজকরা ব্যাখ্যা দাঁড় করান, এই মহিলারা জাদুচর্চার মাধ্যমে স্বামীর প্রথম স্ত্রীকে হত্যা করেছে। মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার ইউরোপে এই উদ্ভট ব্যাখ্যার প্রতিবাদ জানানোর কেউ ছিল না। ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলে অনেক মহিলাকে হত্যা করা হয় শরীরে জন্মদাগ থাকায়। রটিয়ে দেওয়া হয়, এই জন্মদাগ মূলত শয়তানের পক্ষ থেকে দেওয়া চিহ্ন।

উইচহান্টের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ডাইনি চেনার নির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ডও ছিল না। পাদরিদের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা। যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা ধরে এনে হত্যা করতে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। ফলে গির্জা ও এর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠল বেপরোয়া। হয়তো কোনো পাদরির কুপ্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন সুন্দরী কোনো মহিলা, ব্যস প্রতিশোধ নিতে রটিয়ে দেওয়া হলো সেই মহিলা জাদুচর্চা করে, সে ডাইনি। হয়তো পাদরির লোভাতুর দৃষ্টি পড়েছে কারও সম্পদের ওপর, ব্যস, জাদুচর্চার অভিযোগে ধরে আনা হয়েছে পুরো পরিবারকে, হত্যা করা

কমিউনিজমের লাল সন্ত্রাস

ভূমিকা

১৯১৭ সালের সংঘটিত অক্টোবর বিপ্লব সফল হলে রাশিয়ার ক্ষমতায় আসে বলশেভিকরা। কয়েক মাস আগে সংঘটিত ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর জার সাম্রাজ্যের পতন হলে দ্বিতীয় নিকোলাসকে অপসারণকরত অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করা হলেও অক্টোবর বিপ্লবের পর তা মুখ থুবড়ে পড়ে এবং কমিউনিজমের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভ্লাদিমির লেনিন ছিলেন এই বিপ্লবের সম্মুখ নায়কদের একজন, ফলে বিপ্লব-পরবর্তী সরকার কাঠামোয় তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন।

কমিউনিজম ক্ষমতায় এসেছিল সাম্যের স্লোগান দিয়ে, সকল বৈষম্য দূর করার আশা দেখিয়ে। জারদের শাসনের দুঃসহ স্মৃতি ভুলে নতুন আশায় বুক বেঁধেছিল সবাই। কিন্তু দিন যত গেল স্পষ্ট হলো—কমিউনিজম মূলত শোষণের তাত্ত্বিক হাতিয়ার। কথিত মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ জুলুমের পথ আরও সুগম করে। প্রায় ৭০ বছরের শাসনকালে কমিউনিজম প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জুলুমের সূচনা করেছিল। এসব জুলুমকে বৈধতা দেয় কমিউনিজমের তাত্ত্বিক মোড়ক, দেশে দেশে কমিউনিজমের সমর্থকরা এসব জুলুমকেই প্রচার করে সাম্য ও ন্যায়বিচার নামে। কমিউনিজমের অনেক অপরাধের অন্যতম অপরাধ হলো মধ্য এশিয়ায় চালানো নৃশংসতা, সচরাচর যে ইতিহাস আমাদের অজানাই থেকে যায়।

১. মধ্য এশিয়া : সমৃদ্ধ জনপদে কমিউনিজমের থাবা

বলশেভিক বিপ্লবের ফলে নিকটস্থ ভূমিতে অবস্থানরত মুসলমানদের সামনে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হলো। এই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ কী এবং মুসলমানদের সাথে এই বিপ্লবীদের আচরণ কেমন হবে? মধ্য এশিয়ার ভূমিতে মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল না। তারা ছড়িয়ে ছিল প্রায় ১.৫ মিলিয়ন বর্গমাইল এলাকাজুড়ে, আয়তনে যা আফ্রিকা মহাদেশের চেয়েও বড়। এই অঞ্চলের মুসলমানদের ছিল সমৃদ্ধ ইতিহাস। দীর্ঘ সময় তারা উড্ডীন রেখেছে জিহাদের পতাকা। মধ্য এশিয়ার মাটিতেই জন্ম নিয়েছেন জগদ্বিখ্যাত অনেক ইলমি ব্যক্তি। এমন সব ইলমি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তারা, যার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করতে কলম অক্ষম। এই অঞ্চলের মুসলমানদের সাথে রাশিয়ার পুরোনো সম্পর্ক ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে রাশিয়া শাসন করেছিল মুসলমানরাই। মস্কো তখন ছিল বারকে খানের অধীনে। কিন্তু পরে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ

শতাব্দীতে জারের শাসন মুসলমানদের জন্য নিয়ে আসে দুঃসহ স্মৃতি। এ সময় একের পর এক দখল করা হয় মুসলমানদের ভূমি, সেখানে চালানো হয় নির্যাতনের স্টিম রোলার। ফলে বলশেভিকদের হাতে জারের পতন মুসলমানদের জন্য একটি সুযোগ এনে দিয়েছে বলে ধারণা করছিল অনেকে।

অক্টোবর বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর লেনিন এক বক্তব্যে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে মুসলমানরা, তোমাদের মসজিদ, নামাজ, ঈদগাহ, উৎসব-আচার সবকিছু নিরাপদে হবে। তোমরা এগিয়ে এসে জার-বিরোধী বিপ্লবকে সাহায্য করো। তোমাদের মুক্তির সময় ঘনিয়ে এসেছে।'[২০১]

লেনিনের বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছিল, জারের শাসনামলে মুসলমানরা যে নির্যাতন ও অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছিল তা থেকে মুক্তির সময় চলে এসেছে। যদিও এই আশা ছিল বাস্তবতা বিবর্জিত। কারণ, কমিউনিজমের প্রবক্তারা সবাই ছিলেন ধর্মবিদ্বেষী। লেনিন নিজেই বিভিন্ন সময় তার বক্তব্যে বলেছিলেন, 'ধর্ম হলো রূপকথা ও অজ্ঞদের বিষয়। আমি কোনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।' এদিকে অক্টোবর বিপ্লবের পুরোধা ব্যক্তিদের বড় অংশই ছিলেন ইহুদি। লেনিন নিজেও ছিলেন ইহুদি। আর মুসলমানদের প্রতি ইহুদিদের বিদ্বেষ অনেক পুরোনো এবং সামান্য সুযোগ পেলেই এটি প্রকাশে তারা দ্বিধা করে না।

সম্ভবত মুসলমানদের মন থেকে দ্বিধা দূর করতেই লেনিন বেশকিছু পদক্ষেপ নেন, যা থেকে মনে হচ্ছিল তার মনে ইসলামের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই। তার এসব পদক্ষেপের প্রথমটি ছিল মুসহাফে উসমানি বলে পরিচিত কুরআনুল কারিমের একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি মুসলমানদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। ১৮৬৮ সালে জার শাসনামলে এটি মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।[২০২] মুসহাফ ফিরিয়েই ক্ষান্ত হননি লেনিন, জার আমলে জব্দকৃত মুসলমানদের অনেক ঐতিহাসিক নথিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজও তুর্কিস্তান ও ককেশাসের মুসলমানদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। জার আমলে রাশিয়ার ওরেনবার্গ শহরের কিছু মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, লেনিন সেগুলোও চালু করার অনুমতি দেন।[২০৩]

লেনিনের এসব কার্যক্রমে মুসলমানদের মনে হচ্ছিল, তারা এমন একজন শাসকের দেখা পেয়েছে, যিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ সময় কমিউনিস্টরা নানাভাবে তাদের মতবাদ প্রচার করছিল মুসলিম-সমাজে। তাদের আলোচনা থেকে মুসলমানদের অনেকের ধারণা হচ্ছিল, কমিউনিজম হয়তো কুরআন-সুন্নাহ থেকে

---

২০১. *আস-সুরতানুল আহমার*, ৫৯

২০২. সাধারণত বলা হয়, এই মুসহাফটি উসমান রা.-এর সময়ে তৈরি এবং শাহাদাতের সময় তিনি এটিই পাঠ করছিলেন। তবে গবেষক আলেমদের মতে এ তথ্য সঠিক নয়। তাদের মতে এই মুসহাফ অষ্টম বা নবম খ্রিষ্টাব্দে প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে এটি তাশখন্দের জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

২০৩. *আল-মুসলিমুনা ফিল ইতিহাদিস সুফিতি আবরাত তারিখ*, ১/৬১

আহরিত কোনো মতবাদ, যার সাথে ইসলামি শরিয়াহর কোনো সংঘর্ষ নেই। কমিউনিস্টদের বক্তব্যের কারণে মুসলমানদের অনেকেই মনে করতে থাকে, কমিউনিজমের আগমন হয়েছে মুসলমানদেরকে ইংরেজ ও ইউরোপীয় আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করতে।

তবে পরবর্তী বছরগুলোর ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলাম বা মুসলমানদের প্রতি কমিউনিস্টদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। শুরুর দিকে তারা এটা করেছিল বাধ্য হয়ে, যেন জনসমর্থনের অভাবে অক্টোবর বিপ্লব ব্যর্থ না হয়। যখন তারা নিশ্চিত হয় বিপ্লব টিকে গেছে, তখনই তারা নিজেদের আসল চেহারা প্রকাশ করে। ফলে বিপ্লবের শুরুতে কমিউনিস্টদের কাছে মুসলমানরা যে আশা করেছিল, তা মিলিয়ে যায় খুব দ্রুতই।

কমিউনিজম তার প্রথম আঘাত হানে বিপ্লবের পরের বছর, ১৯১৮ সালে। এ আঘাতের লক্ষ্যবস্তু ছিল তৎকালীন তুর্কিস্তান। তুর্কিস্তান বলতে বোঝানো হয় বর্তমান তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান ও চীনের জিনজিয়াং[২০৪] অঞ্চলকে। বুখারা, তিরমিজ, সমরকন্দ, মার্ভ, কাশগড়ের মতো ইসলামি ঐতিহ্যসমৃদ্ধ শহরগুলো এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এর রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস। এখানে জন্মেছেন ইবরাহিম বিন আদহাম, আবু যায়দ বলখি, ফজলুল্লাহ মাইহানি, আবদুল্লাহ আনসারি, শায়খ বাহাউদ্দিন নকশবন্দি, আজিজ নাসাফি ও আলাউদ্দিন সিমনানির মতো বিখ্যাত সুফিগণ। জন্মেছেন আবু লাইস সমরকন্দি, জারুল্লাহ যমখশরি, শায়খ শিহাবুদ্দিন, শায়খ আলি সমরকন্দি ও হারুরি বুশানজির মতো প্রখ্যাত মুফাসসিরগণ। যাদের লিখিত তাফসিরগ্রন্থগুলো সমৃদ্ধ করেছে ইসলামি-বিশ্বকে। এখানেই জন্মেছেন আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজি, ইমাম নাসায়ি, ইমাম দারেমি, ইমাম আবু দাউদ, হাকিম তিরমিজি ও ইমাম কাফফাল শাশি-এর মতো সুপরিচিত মুহাদ্দিসগণ। এখানে জন্মেছেন ইলমুল কালাম ও ফিকহের ইমামগণও। এখানে জন্মেছেন শামসুল আইম্মা সারাখসি, আলাউদ্দিন তুর্কমানি, শাইখুল ইসলাম রাজিউদ্দিন সারাখসি, বুরহানুদ্দিন মারগিনানি, ইমাম সামআনি, আবু নসর ইসমাইল বিন হাম্মাদ জাওহারি ও সিরাজুদ্দিন ইউসুফ সাক্কাকির মতো বহু আলেম, যাদের বাদ দিয়ে ইসলামি ফিকহশাস্ত্র নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে অক্ষম ছিল।

এককথায় ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির এক অনুপম নিদর্শন ছিল এ অঞ্চল। খেলাফতে রাশেদা ও উমাইয়া যুগেই এ অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকা মুসলমানদের হাতে জয় হয়। তাতার আক্রমণের আগপর্যন্ত এ এলাকায় মুসলমানরা সুখস্বাচ্ছন্দ্য-সমৃদ্ধির সাথে বসবাস করছিল। তবে তাতারদের আক্রমণের ফলে প্রায় এক শতাব্দী

২০৪. চীনা তুর্কিস্তান।

যাবৎ এখানকার জনপদগুলো মুসলিমশূন্য হয়ে পড়ে; কিন্তু পরে তাতাররা ইসলাম গ্রহণ করলে আবারও এখানে মুসলিম শাসন ফিরে আসে। তবে জার শাসনামলে তাদের শ্যেনদৃষ্টির শিকার হয় এ অঞ্চল। ১৭৫০ সাল থেকে জার শাসিত রাশিয়া এ অঞ্চলে আগ্রাসন শুরু করে। তাদের এ আগ্রাসনের মোকাবিলায় দাগিস্তানে মানসুর আশরুমা ও ইমাম শামিল-সহ অন্যান্য মুজাহিদ এগিয়ে আসেন। দাগিস্তানের বাইরে অন্যান্য অঞ্চলেও প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৮৮৫ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে তুর্কিস্তানে ১৬ বার জারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়।

অক্টোবর বিপ্লবের পর এ অঞ্চলের মুসলমানরা ভেবেছিল এবার তারা নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। লেনিনের প্রাথমিক বিভিন্ন পদক্ষেপ ও বক্তব্য তাদেরকে সাহস জোগাচ্ছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা পূর্ণ ক্ষমতা পেয়েই মধ্য এশিয়ায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু করে। মধ্য এশিয়ার মেধাবী তরুণদের মস্কো এনে তাদের মগজ ধোলাইয়ের কাজ চলতে থাকে জোরেশোরে। তাদেরকে দীক্ষিত করা হয় মার্কসের মতবাদে। তাদের মন থেকে মুছে ফেলা হয় ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য। আল্লাহর নির্দেশিত বিধানের চেয়ে মানবরচিত মতবাদ তাদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। এই তরুণরা নিজেদের দেশে ফিরে প্রচার করতে থাকে কমিউনিজম। ইসলামের প্রতি চূড়ান্ত অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে তাদের বক্তব্যে। ফারগানার একজন বাসিন্দা আজম হাশেমি তার স্মৃতিকথায় এমন একজন প্রচারকের ইসলামবিদ্বেষের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এ ধরনের প্রচারকরা কৃষকদের অধিকার ও সমবণ্টননীতির কথা বলে তরুণদের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

তবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন না লেনিন। ১৯১৮ সালের এপ্রিলে তিনি কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন তুর্কিস্তানে হামলা করতে। নির্দেশ পেয়ে তুর্কিস্তানের মাটিতে প্রবেশ করে রুশ বাহিনীর দৈত্যাকার ট্যাংকগুলো, আকাশে উড়তে থাকে বোমারু বিমান। নির্বিচারে বোমা নিক্ষেপ করা হয়, সামরিক ও বেসামরিক মানুষের কোনো তফাত না করেই চালানো হয় হত্যাযজ্ঞ। এই নির্মম সামরিক অভিযানে নিহত হয় প্রচুর মানুষ। তাদের সংখ্যাটা অবশ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না, যেভাবে নির্ধারণ করা যায় না কমিউনিজম আমলে সংঘটিত অন্য হত্যাকাণ্ডগুলোতে নিহতের সংখ্যাও। একই বছরের শেষ দিকে উত্তর ককেশাসে চালানো হয় রুশ অভিযান, ফিরে আসে জার আমলে চালানো অভিযানের দুঃসহ স্মৃতি। লেনিনের বক্তব্যের এক বছর পার না হতেই স্পষ্ট হয়ে যায় কমিউনিজমের ইসলামবিদ্বেষ।

২. বুখারার পতন : ঐতিহ্যের শহরে বিষাদবেদনা

মা-ওয়ারাউন্নাহারে অবস্থিত বুখারা শহর হাজার বছর যাবৎ ধারণ করে আছে মুসলিম সভ্যতার ঐতিহ্য। বর্তমানে এই শহরটির অবস্থান উজবেকিস্তানে। কিন্তু কমিউনিজমের আগ্রাসনকালে এটি ছিল সমৃদ্ধ তুর্কিস্তানের অংশ। বুখারা প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম

শাসনামলেরও আগে। এর গোড়াপত্তন করেছিলেন সিয়াওয়াশ বিন কাইকাওয়াস।[২০৫] ৫৪ হিজরিতে মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলে খুরাসানের গভর্নর উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ সন্ধির মাধ্যমে শহরটির অধিকার লাভ করেন। তবে কয়েক বছর পর শহরটি মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ৯০ হিজরিতে কুতাইবা বিন মুসলিম যুদ্ধের মাধ্যমে শহরটি জয় করে পুনরায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।[২০৬]

মুসলিম শাসনামলে এই শহরটি হয়ে ওঠে ইলমচর্চার শহর। এখানে জন্ম নেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ। এ শহরেই জন্মেছেন মুহাদ্দিস ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, যিনি তার শিষ্য ইমাম বুখারিকে *সহিহ বুখারি* গ্রন্থ সংকলন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এখানে জন্মেছেন ইমাম বুখারি, ইসলামি দুনিয়ায় যার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। এখানে জন্মেছেন *তারিখে বুখারা* গ্রন্থের লেখক আল্লামা গুনজার, যার সম্পর্কে হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরি বলেছেন, 'তিনি তার যুগের ইমাম ছিলেন।' শাইখুল ইসলাম ইয়াজিদ বিন হারুনও জন্মেছেন এই শহরেই। তিনি ছিলেন আলি ইবনুল মাদিনি ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতো যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের শিক্ষক।[২০৭]

১৮৬৮ সালে জারের শাসনামলে বুখারা মুসলমানদের হাতছাড়া হয়। অক্টোবর বিপ্লব সফল হলে বুখারার তরুণদের মধ্যে কমিউনিজমের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ দেখা দেয়। এ তরুণদের বড় অংশ ছিল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত; যেকোনো নতুন মতবাদের প্রতি তাদের বেশ দুর্বলতা ছিল। তরুণদের এই অংশটি শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও স্বাধীন মত প্রকাশের পক্ষে দাবি তোলে।[২০৮] তরুণদের এই দলে উসমান খাজা ও আবদুর রউফ নামে দুজন সক্রিয় কমিউনিস্ট ছিল, যারা ছলেবলে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিল। ১৯১৯ সালের নভেম্বরের দিকে কমিউনিস্টরা বুখারায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা প্রকাশ্যে নিজেদের মতবাদ জানান দিতে থাকে এবং রাশিয়ার কমিউনিস্টদের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলে। ১৯২০ সালের শুরুতে কমিউনিস্টদের একটি বৈঠকে প্রস্তাব করা হয়, রাশিয়ান কমিউনিস্টরা বুখারায় হামলা চালাবে। সে ক্ষেত্রে আঞ্চলিক কমিউনিস্টরা তাদেরকে সাহায্য করবে।

১৯২১ সালে তারা বুখারা আক্রমণ করে। আগস্টের শেষ দিকে চালানো এই হামলায় বুখারার অপ্রস্তুত ও নিরস্ত্র নাগরিকরা কার্যত কোনো প্রতিরোধ গড়ে

---

২০৫. *আল-বাদউ ওয়াত তারিখ*, ৩/১৫১

২০৬. *তারিখে তাবারি*, ৬/৪৩৪

২০৭. *তাজকিরুল আনাম বিল-মুদুনিল আলাম*, ২৬৩

২০৮. বিভিন্ন নথিপত্র থেকে জানা যায়, ১৯০৫ সাল থেকেই বুখারার শিক্ষিত তরুণদের চিন্তাজগতে একপ্রকার অস্থিরতা শুরু হয়। পুরোনো ঐতিহ্যবাহী ধারার পরিবর্তে নিত্যনতুন মতবাদের দিকে তাদের ঝোঁক ছিল স্পষ্ট। বিশেষ করে নতুন করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গোপনে তরুণদের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক অস্থিরতা ছড়াতে শুরু করে। বোখারার আমির বিষয়টি টের পেয়ে এ ধরনের বেশকিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন এবং অন্যগুলোকে নজরদারির আওতায় আনেন।

তোলারই সময় পায়নি।[২০৯] রেড আর্মির অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সামনে বুখারার মজবুত প্রাচীরও দুর্বল প্রমাণ হয়। শহর রক্ষার দায়িত্বে থাকা দেড়শ নৈশপ্রহরীকে কমিউনিস্টরা কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। রাত চারটার দিকে পুরো শহর যখন ঘুমে বিভোর তখন আচমকা গর্জে ওঠে রুশ সেনাদের ট্যাংকগুলো। কমিউনিজমের স্লোগান দিতে দিতে শহরে প্রবেশ করে রেড আর্মি। নির্বিচারে হত্যা করে শহরের নিরস্ত্র জনসাধারণকে। আলেম ও জনসাধারণের একাংশ তাদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালায়; কিন্তু রেড আর্মি সহজেই এই দুর্বল প্রতিরোধ নস্যাৎ করে দেয়। শহরে অবস্থানরত কমিউনিস্টরা রুশ সেনাদের সাথে হাত মেলায় এবং শহরের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। তারা শহরের বিভিন্ন স্থাপনা-সম্পর্কিত তথ্য ও অলিগলির ম্যাপ সরবরাহ করে রুশ সেনাদের। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই রুশ সেনারা পুরো শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়। প্রতিরোধকারীদের সবাইকে শহিদ করা হয়। ১৪ দিনের এই যুদ্ধে বুখারার অন্তত ৫০ হাজার বাসিন্দাকে হত্যা করা হয়। শিশু, নারী ও বৃদ্ধদেরকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় শহরের বিভিন্ন স্থাপনায়। এক মাস পরেও দেখা যায় অনেক ভবনে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে।[২১০]

একজন প্রত্যক্ষদর্শী যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে—প্রতিটি অলিগলিতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের প্রস্তুতি ছিল কম। গোলাবারুদ ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিল বটে, কিন্তু যোদ্ধারা মনোবল ধরে রেখেছিল। পুরো শহরে ছিল অস্ত্রের গর্জন ও বারুদের গন্ধ। রুশ আগ্রাসনের সামনে আমাদের মাটির দেওয়ালগুলো ছিল খুবই দুর্বল বাধা; কিন্তু আমরা তাদের হাতে সহজে কিছুই তুলে দিইনি। প্রতিটি অলিগলি ও বাড়ির জন্য যুদ্ধ করেছি তাদের সাথে।[২১১]

শহরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর নিজেদের ধর্মবিদ্বেষ স্পষ্ট করে কমিউনিস্টরা। প্রথম ধাপেই তারা শহরের মসজিদ-মাদরাসাগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করে। তারা শহরের অনেক প্রাচীন মাকতাবা বা পাঠাগার পুড়িয়ে দেয়। পুড়ে ছাই হয়ে যায় হাজার বছরের মুসলমানদের জ্ঞানশাস্ত্র। মূলত কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মারকগুলো ধ্বংস করা। রুশ প্রাচ্যবিদ ভ্যাসিলি বার্টোল্ড বুখারা পতনের কিছুদিন পর সেখানে সফর করেছিলেন। সে সময় তিনি দেখেন, মুসলিম আমলে তৈরি বেশকিছু বইপত্র আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এসব বইপত্রের বাঁধাই ছিল সোনায়

---

২০৯. হামলার পুরো পরিকল্পনাটি সফলতার সাথে গোপন রাখা হয়েছিল। বোখারার আমির ধারণাও করতে পারেননি এমন কিছু ঘটবে। এর কয়েক দিন আগেই তিনি সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলেছিলেন, যেখানে তাকে আশ্বস্ত করা হয়, তিনি বিব্রত হন এমন কোনো পদক্ষেপ কমিনিস্টরা নেবে না। দেখুন, *বুখারা কা জমহুরি ইনকিলাব*, ২৩

২১০. *আদওয়াউন আলা তারিখি তুরান*, ১৪৮

২১১. *ডন ওভার সমরকন্দ*, ১১৪-১১৫

মোড়ানো।[২১২] কমিউনিস্টরা বুখারার সরকারি কোষাগারেও হামলা করে এবং সেখানে সংরক্ষিত বিপুল নগদ অর্থ ও সোনা-রুপা মস্কো নিয়ে যায়। মুখে সাম্যের কথা বললেও লুণ্ঠনের প্রতি কমিউনিস্টদের ছিল আজন্ম টান। উসমান খাজাকে দেওয়া হয় তার আনুগত্যের পুরস্কার। তাকে বানানো হয় বুখারার পুতুল সরকারের প্রধান।[২১৩]

আজম হাশেমির মতে, কমিউনিস্ট আগ্রাসনের আগে বুখারায় ৮০০ মাদরাসা ছিল; কিন্তু আগ্রাসনের পর সবগুলো মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এসব মাদরাসাকে নাইট ক্লাব, গুদামঘর ও কমিউনিস্টদের আড্ডার স্থান বানানো হয়। ধর্মীয় ব্যক্তিদের বড় অংশকে অভিযানের শুরুতেই হত্যা করা হয়েছিল, আর যারা তখনো জীবিত ছিলেন এবং কমিউনিজমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেননি, তাদের স্থান হলো কারাগারে। প্রকাশ্যে ধর্মীয় বিধিবিধান পালনেও করা হলো কড়াকড়ি। মেয়েদের পর্দা নিষিদ্ধ করা হলো, উৎসাহ দেওয়া হলো বেপর্দা ও ফ্রি-মিক্সিংকে। খাদিজা বেগম নামে এক স্থানীয় মহিলার স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, কীভাবে পর্দানশিন মেয়েদেরকে কমিউনিস্টদের সাথে মেলামেশা করতে বাধ্য করা হয়েছিল। হাজার বছরের ইসলামি ঐতিহ্যবাহী এই শহর থেকে ইসলামের সকল চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করে কমিউনিস্টরা। নিষিদ্ধ করা হয় সকল প্রকার ওয়াজ-মাহফিল ও ইসলামি অনুষ্ঠান। কুরআনুল কারিমের নুসখা ঘরে রাখাও অপরাধ বলে গণ্য করা হয় এবং এই অপরাধে অনেককে হত্যা করা হয়। শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জামের লেখা থেকে জানা যায়, একবার একজন রুশ মুসলমান জানতে পারলেন এক ব্যক্তির কাছে কুরআনুল কারিম আছে। তখন তিনি সেটি দেখার উদ্দেশ্যে ৩৫০০ কিলোমিটার সফর করে তার কাছে যান। কারণ, এর আগে তিনি কখনো কুরআনুল কারিম দেখেননি![২১৪] মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করাকে নিষিদ্ধ করা হয়। অজুহাত দেখানো হয়, মসজিদে সবাই একত্রিত হলে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে।

কমিউনিস্ট আগ্রাসনের পূর্বে বুখারায় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ধর্মীয় শিক্ষাভিত্তিক। সে সময় সাধারণ শিক্ষাকে মুসলিম-সমাজে বিরক্তির চোখেই দেখা হতো এবং সমাজে তাদের বিশেষ সম্মান ছিল না। কমিউনিস্টরা এই বিষয়টিকে টার্গেট করে কাজে নামে। তারা সকল প্রকার ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করে। সবাইকে কমিউনিস্টদের প্রণীত পাঠ্যক্রম অনুসরণে বাধ্য করে। তারা চাচ্ছিল এভাবে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক সেবাদাস প্রজন্ম তৈরি করতে। এবং অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যায়, ধর্মীয় সমাজের মধ্যেই কমিউনিজমপ্রেমী একদল লোকও গড়ে উঠেছে। ফখরুদ্দিন খেদিভ নামে একজন আলেম তার বক্তব্যে কমিউনিজমের গুণগান গাইতে গিয়ে বলেন, 'কমিউনিজম

---

২১২. *তুর্কিস্তান মাজিহা ওয়া-হাযিরুহা*, ৩৪০

২১৩. নতুন সরকার কাঠামোতে কমিউনিস্টদেরকেই রাখা হয়। মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের নাম জানতে দেখুন, মুসা তুর্কিস্তানির লিখিত *উলুগ তুর্কিস্তান ফাজি আসি*, ১/৩৩১

২১৪. *আস-সুরতানুল আহমার*, ৬৭

আমাদের মাঝে শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে। আমি তাদের মঙ্গল কামনা করি। তারা যা করছে, এসবই রাসুলুল্লাহর নীতি।' মূলত এসবই ছিল কমিউনিজম-পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার কুফল।

কমিউনিস্টরা জনগণের মনে নিজেদের মতবাদ পোক্ত করতে সিনেমা-নাটকের সাহায্য নেয়। এসব সিনেমা ও নাটকে কার্ল মার্কস, লেনিন প্রমুখের চিন্তাধারা ও জীবনদর্শনকে আদর্শ হিসেবে দেখানো হতো। গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয় কমিউনিস্টদের পার্টি অফিস। এই অফিসের কাজ ছিল কমিউনিজম প্রচার করা এবং এলাকার ধার্মিক মহলকে চিহ্নিত করে তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা। নিজেদের স্বার্থে গুনাহ ও পাপাচারকে উসকে দেয় কমিউনিস্টরা। ফ্রি-মিক্সিংকে আধুনিকতা হিসেবে দেখানো হয় এবং তরুণীদেরকে পর্দা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। নিজেদের নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি এলাকায় ক্লাবঘর প্রতিষ্ঠা করে কমিউনিস্টরা। মুসলিম তরুণীদের উৎসাহ দেওয়া হয় ক্লাবঘরে এসে আড্ডা দিতে এবং ছেলেবন্ধু খুঁজে নিতে। মজার ব্যাপার হলো, ক্লাবঘরে যেতে বেপর্দা হওয়া আবশ্যক ছিল না, কিন্তু সেখানকার পরিবেশই এমন ছিল যে, মুসলিম তরুণীরা অল্প সময়েই বেপর্দা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠত।[২১৫]

কমিউনিস্টদের এই চাল ছিল ভয়ংকর। অল্পদিনেই মুসলিম নারীদের নৈতিক চরিত্রে চরম স্খলন দেখা দেয়। তারা কমিউনিস্ট যুবকদের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং পরিবার ত্যাগ করে। অনেকে এই মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে মতবাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করার ঘোষণা করে। বুখারার এক ব্যক্তির স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে কমিউনিস্টদের পার্টি অফিসে আশ্রয় নেয়। লোকটি স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য পার্টি অফিসে যায়, কিন্তু সেখানে তাকে লাঞ্ছিত করা হয়। ফেরার পথে রাত নেমে এলে সে এক বন্ধুর বাড়িতে রাতযাপন করে। শেষরাতে সে জানতে পারে, বন্ধুর স্ত্রীও রাতের বেলা বন্ধুকে ত্যাগ করে চলে গেছে। দুই বন্ধু তখনই সেই মহিলার সন্ধানে বের হয়। কয়েক মাইল দূরে পাশের গ্রামে মহিলাকে আটক করতে সক্ষম হয় তারা। দুই বন্ধু মিলে তখনই মহিলাকে হত্যা করে এবং তার লাশ নদীতে ফেলে দেয়।[২১৬]

নারীদের বেপর্দা করার জন্য তাদেরকে আলেমদের বিরুদ্ধে উসকে দেয় কমিউনিস্টরা।[২১৭] মুসলিম নারীরাই স্লোগান দিতে থাকে—মোল্লাতন্ত্র নিপাত যাক। অথচ কমিউনিস্ট শাসনের আগে এমন স্লোগান কল্পনাও করা যেত না। সমাজের সর্বত্র আলেমদের সম্মান অটুট ছিল। কমিউনিস্টরা আলেমদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে থাকে এবং অন্যদেরও উসকাতে থাকে। কারণ নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধর্মীয় বলয় ভেঙে ফেলা তাদের জন্য জরুরি ছিল। বিভিন্ন শহরে স্থাপিত পার্টি

২১৫. *মাশরিকি ইউরোপ কি মুসলমান রিয়াসতে*, ১৯৬

২১৬. *ডন ওভার সমরকন্দ*, ২৭৭

২১৭. সাম্প্রতিক বাংলাদেশেও দেখা যাচ্ছে, নারীবাদের মোড়কে ধর্ম ও আলেমবিদ্বেষ প্রচার করা হচ্ছে।

অফিসের মাধ্যমে সুন্দরী মুসলিম নারীদের চিহ্নিত করা হয় এবং তাদেরকে মস্কো ভ্রমণে পাঠানো হয়। মস্কো ভ্রমণে যাওয়া এক নারী পরে স্মৃতিচারণ করেছেন, সেখানে কমিউনিস্টরা আমাদের সাথে এমন আচরণ করত, যা কেবল বাজারি মহিলাদের সাথেই করা যায়।

নারীদের বেপরোয়া ও লাগামহীন করার মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার মজবুত পারিবারিক কাঠামোতে আঘাত করে কমিউনিস্টরা। মুসলিম পরিবারগুলোতে শুরু হয় দাম্পত্যকলহ। তাশখন্দের মহিলা কমিউনিস্ট নেত্রী খুজাইয়া তার স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন, স্বামী ফয়জুল্লার সাথে তার নিয়মিত ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। তার স্বামী চাইতেন না তিনি ঘরের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন এবং বেপর্দা চলাফেরা করেন। তবে পরে খুজাইয়ার মোহভঙ্গ হয়। তিনি লক্ষ করেন, বিপ্লবের নামে কমরেডরা নারীদের সতীত্ব হরণে ব্যস্ত।

বেপর্দা মহিলাদের সতীত্ব হরণ করেই ক্ষান্ত হতো না কমিউনিস্টরা, অনেক সময় তারা পর্দানশিন মহিলাদেরকেও অপহরণ করে ধর্ষণ করত। গবেষক ই এস বেটস স্পষ্ট করেই লিখেছেন, কমিউনিস্টদের কাছে মহিলা মানেই ছিল ভোগের বস্তু। কোথাও কোনো সুন্দরী মহিলার সন্ধান পেলেই ঘর থেকে তুলে এনে ধর্ষণ করত তারা।[২১৮] এককথায়, তাকওয়ার মূল্যবোধে গড়ে ওঠা সমাজ কাঠামো ভেঙে কমিউনিস্টরা নিজেদের পছন্দসই ব্যবস্থা চালু করে, যেখানে নৈতিক মূল্যবোধের বিচারে মানুষ ও পশুর মাঝে বিশেষ তফাত ছিল না।

তবে কমিউনিজমের এই আগ্রাসনের যুগেও এখানকার মুসলমানরা নিজেদের স্বকীয়তা ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তারা গোপনে নিজেদের ঘরের ভেতর মাদরাসা গড়ে তোলে। সেখানে চলতে থাকে ধর্মীয় পাঠদান। এর সবই চলে কমিউনিস্টদের নজরদারি থেকে লুকিয়ে। দিনের বেলা তারা নিজেদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করতেন, তারপর রাতে কমিউনিস্ট সেনারা যখন মদ ও নারী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত, সে সময় মুসলমানদের ঘরে ঘরে চলত কুরআনুল কারিম ও দীনি শিক্ষার মজলিস। এভাবে এ অঞ্চলের মুসলমানরা নিজেদের মাঝে ইলমচর্চা অব্যাহত রাখে। কমিউনিজমের আগ্রাসনের যুগেও সমাজের একটি শ্রেণি গোপনে নিজেদের স্বকীয়তা ধরে রেখেছিল। এর সুফল দেখা যায় ৭৪ বছর পর সোভিয়ত ইউনিয়নের পতন হলে। তখন এ অঞ্চলে প্রচুর আলেম-উলামা দেখা যায়, যারা সমাজের ধর্মীয় নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। বিষয়টি কমিউনিস্টদের অবাক করেছিল। তারা ভেবেছিল, এখানে আর কখনো আলেম তৈরি হবে না। এখানকার মানুষের মন থেকে তারা ইসলাম মুছে ফেলতে পেরেছে। কিন্তু তাদের জানা ছিল না, গোপনে এখানকার বাসিন্দারা কতটা বেগবানরূপে নিজেদের মাঝে ইলমচর্চা অব্যাহত রেখেছিল।

---

২১৮. *সোভিয়েত এশিয়া*, ১৪৯